ভাষার পমিত রপ ও রীতি শেখার পয়োজনীয়তা

ভাষা মানুষকে অন্য পাণীর তুলনায় আলাদা করে চিনতে সাহায্য করে। ভাষার মাধ্যমেই আমরা আমাদের ভাব, অনুভতি, জ্ঞান এবং সংস্কৃতির বহুমাত্রিক পকাশ ঘটাই। তবে ভাষা শুধুই কথার বা লেখার মাধ্যম নয়; এটি একটি বিন্যস্ত কাঠামো, যার নিয়ম, শঙ্খলা এবং পমিত রীতি রয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রে ভাষার পমিত রপ ও রীতি শেখা শিক্ষাথীর জন্য এবং সাধারণ মানুষের জন্য সমানভাবে গুরতপূণ। এটি শুধু ভাষার ঠিক ব্যবহার শেখায় না; বরং লেখার সৌন্দয, বোধগম্যতা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহায ভমিকা পালন করে।

ভাষার পমিত রপ বলতে আমরা সাধারণত সেই রপ বুঝি; যা শব্দচয়ন, বাক্য গঠন, উচ্চারণ ও ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী ঠিক। অন্যদিকে, পমিত রীতি হলো ভাষার ব্যাবহারিক দিক, যা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কথ্য এবং লিখিত রূপে স্াভাবিক ও সহজভাবে ব্যবহৃত হয়। পমিত রীতি শিখলে শিক্ষাথী কেবল ভাষার শুদ্ধতা অজন করে না, বরং এটি তার সাহিত্যিক যোগ্যতা এবং সাংস্কৃতিক চেতনাও উনত করে।

পথমত, পমিত রীতি শেখার সবচেয়ে বড়ো পয়োজনীয়তা হলো ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার নিশ্চিত করা। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক সময় আমরা নানা রকম শব্দচয়ন, ক্রিয়া পদ এবং বাক্যগঠন ব্যবহার করি, যা কখনও কখনও ভাষার সৌন্দয এবং অথ পকাশে ব্যাঘাত ঘটায়।

দ্বিতীয়ত, পমিত রীতি ভাষার সৌন্দয বদ্ধি করে। সুন্দর ও পরিমাজিত ভাষা পাঠকের মনে পভাব ফেলে এবং ভাবের গভীরতা স্পষ্ট করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে পযোজ্য। কবিতা, গল্প, পবন্ধ, নাটক এবং নিবন্ধে পমিত রীতির ব্যবহার পাঠকের মনকে আকষ্ট করে এবং লেখকের ভাব পকাশকে শক্তিশালী করে।

ততীয়ত, পমিত রীতি শেখার মাধ্যমে ভাষার স্চ্ছতা ও বোধগম্যতা নিশ্চিত হয়। অনেক সময় লেখকের বক্তব্য পাঠকের কাছে জটিল এবং বোঝার জন্য কঠিন মনে হয়। এতে পাঠক বিভ্রান্ত হয় এবং লেখার মূল ভাব পৌছায় না।

চতুথত, পমিত রীতি শেখার মাধ্যমে শিক্ষাথী ভাষার নিয়ম ও ব্যাকরণ ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারে। পতিটি ভাষার নিজস্ ধ্বনি, শব্দরপ ও বাক্য গঠনের নিয়ম রয়েছে। পমিত রীতির মাধ্যমে এই নিয়মগুলো শেখা সহজ হয়।

পঞ্চমত, ভাষার পমিত রীতি শেখা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় গুরতপূণ ভমিকা পালন করে। ভাষা কেবল ভাব পকাশের মাধ্যম নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং জাতীয় পরিচয়ের বহিঃপকাশ। যখন আমরা পমিত রীতি ও শুদ্ধ রপ ব্যবহার করি, তখন আমরা ভাষার ঐতিহ্য রক্ষা করি এবং ভবিষ্যৎ পজন্মের জন্য ভাষার মান বজায় রাখি।

অতএব, ভাষার পমিত রপ ও রীতি শেখার গুরত কেবল ভাষার শুদ্ধতা বা সৌন্দযের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি শিক্ষাথীকে শেখায় ভাষার সংবেদনশীলতা, সাহিত্যিক দক্ষতা, স্পষ্ট ভাব পকাশ, বোধগম্যতা, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং ব্যাকরণগত নিয়মের সচেতন ব্যবহার। এই শিক্ষার মাধ্যমে একজন শিক্ষাথী কেবল নিজের ভাষাগত দক্ষতা বদ্ধি করে না, সমাজে ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার ও সাহিত্যিক মানোনয়নেরও অংশীদার হয়।

প্রমিত রীতির উৎস ও প্রয়োগ

- বিশ শতকের কলকাতার শিক্ষিত সমাজের কথ্য ভাষার ভিত্তিতে গঠিত।
- ধীরে ধীরে সাধু রীতিকে সরিয়ে দিয়ে প্রধান রীতি হিসেবে গৃহীত হয়।
- রেডিয়ো, সংবাদপত্র, পাঠ্যবই ও সরকারিভাবে প্রণীত নথিপত্রে এই রীতি ব্যবহৃত হয়।

প্রমিত রীতির বৈশিষ্ট্য:

- ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গ সংক্ষিপ্ত রূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন– করছে, করেছিল, করবে, তারা, এদের, যা, তা, থেকে, হতে, সঙ্গে ইত্যাদি।
- বিষয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী শব্দ নির্বাচন করা যায়। যেমন– বছর বা বৎসর, চাঁদ বা চন্দ্র– উভয়ই গ্রহণযোগ্য।
- কথ্য ভাষার কিছু শব্দ পরিহারযোগ্য। যেমন– ধুলো → ধুলা, পুজো → পূজা, মুলো → মুলা ইত্যাদি।

সাহিত্যিক উদাহরণ (প্রমিত রীতি):

"এখানে ভাষা চুপ করে আছে, প্রবাহ স্থির হয়ে আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়ে আছে।"

দাপ্তরিক উদাহরণ (প্রমিত রীতি):

"আমরা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি যে, আমরা যাতে স্বাধীন সত্তায় সমৃদ্ধি লাভ করতে পারি..."

পমিত ভাষা ও উপভাষার মধ্যে পাথক্য:

ক্রমিক	পমিত ভাষা	উপভাষা
১	ভাষার শুদ্ধ ও স্কৃত রূপ, যা সাধারণভাবে শিক্ষাব্যবস্থা ও সাহিত্যিক ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়।	কোনো নিদিষ্ট অঞ্চল, স্থান বা সম্প্রদায়ের ভাষার আঞ্চলিক রূপ।
২	সমস্ত শিক্ষিত মানুষের জন্য বোধগম্য।	শুধু ওই অঞ্চলের মানুষের জন্য সুবোধ্য।
৩	শব্দচয়ন ও উচ্চারণ পরিমাজিত ও মানক।	শব্দচয়ন ও উচ্চারণ অঞ্চলভিত্তিক।
৪	ব্যাকরণ ও শব্দগঠন পায়শই নিয়ম মেনে চলে।	ব্যাকরণ বা শব্দগঠন মাঝে মাঝে চলিত রীতির থেকে ভিন।
৫	লেখার ও কথার ক্ষেত্রে সরাসরি ব্যবহারযোগ্য।	কেবল কথ্য ভাষায় পায়শই ব্যবহার হয় কিন্তু লেখা বা শিক্ষায় কম ব্যবহার হয়।
৬	সাহিত্যিক ও শিক্ষামূলক কাজে ব্যবহৃত।	সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত।
৭	বিভিন অঞ্চলের মানুষদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।	কেবল স্থানীয় মানুষের মধ্যে যোগাযোগ সহজ করে।
৮	শুদ্ধ রূপের কারণে ভাষার সৌন্দয ও পরিমাজন বজায় রাখে।	আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ভাষার স্াভাবিকতা ও স্াদ পকাশ করে, কিন্তু শুদ্ধতা কম থাকে।
৯	পমিত ভাষা শেখা সবার জন্য পয়োজনীয়, কারণ এটি ভাষার মান রক্ষা করে।	উপভাষা শেখার বিশেষ পয়োজন নেই, এটি কেবল আঞ্চলিক বৈচিত্র্য বোঝাতে সাহায্য করে।
১০	উদাহরণ: 'আমি বই পড়ছি।'	উদাহরণ: 'আমি বই পড়তেছি।' (ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক রূপ)

সাধু রীতি ও পমিত রীতির মিশণ দূষণীয়

বাংলা ভাষায় দুটি পধান রীতি বিদ্যমান– সাধু রীতি ও পমিত রীতি। সাধু রীতি মূলত পাচীন, সাহিত্যিক এবং সংস্কৃতিভিত্তিক। এটি শব্দচয়ন, ক্রিয়া পদ এবং বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে পরিমাজিত ও গঠনগতভাবে সুশৃঙ্খল। অন্যদিকে, পমিত রীতি আধুনিক, সরল এবং দৈনন্দিন ব্যবহারভিত্তিক। এটি সাধারণ পাঠকের জন্য সহজবোধ্য এবং স্াভাবিক। সমস্যাটি তখন দেখা দেয় যখন কোনো লেখক বা বক্তা এক বাক্যে বা লেখায় উভয় রীতি মিশিয়ে ব্যবহার করে। এমন সংমিশণকে ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'দূষণীয় রীতি' বলা হয়।

দূষণীয় রীতি সাধারণত বাক্যকে অস্াভাবিক এবং অপাকত করে তোলে।

উদাহরণস্রপ: বাক্যটি ধরি– 'তোমার কাছে কবে যাইব আমি?' এখানে 'তোমার কাছে' পমিত রীতির এবং 'যাইব আমি' সাধু রীতির। ফলে বাক্যটি পাঠকের কাছে ভারসাম্যহীন মনে হয়। শুদ্ধ রূপ হতে পারে পমিত রীতির জন্য– 'আমি কখন তোমার কাছে যাব?' অথবা সাধু রীতির জন্য– 'কখন আমি তোমার কাছে যাইব?' একইভাবে, 'সে পড়িতেছে বইটি।'– বাক্যটিও দূষণীয়, কারণ এখানে সাধু রীতির ক্রিয়া পদ 'পড়িতেছে' পমিত রীতির চলিত বাক্য গঠনের সঙ্গে মিশেছে। শুদ্ধ রূপ হতে পারে পমিত রীতিতে– 'সে বইটি পড়ছে।'

দূষণীয় রীতির অন্যতম কারণ হলো লেখক বা বক্তার অভ্যাসগতভাবে দুই রীতি ব্যবহার করা। পাচীন ও আধুনিক রীতির নিয়মের যথাযথ জ্ঞান না থাকা এবং ভাষার সৌন্দয বা পাঠযোগ্যতার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়াও এর অন্যতম কারণ। এই ধরনের সংমিশণ ভাষার স্াভাবিকতা নষ্ট করে, অথ পকাশে অস্পষ্টতা তৈরি করে এবং সাহিত্যিক বা শিক্ষামূলক লেখায় বিভ্রান্তি সষ্টি করে।

সুতরাং, লেখক বা বক্তার জন্য সবোত্তম হলো একটি রীতি নিধারণ করে ধারাবাহিকভাবে তা ব্যবহার করা। সাহিত্যিক ও গম্ভীর বক্তব্যের জন্য সাধু রীতি পয়োগ করা যায়, যেখানে ভাষার মাধুয ও আভিজাত্য বজায় থাকে। অন্যদিকে, দৈনন্দিন ব্যবহার, শিক্ষামূলক বা সাধারণ লিখিত ভাষার জন্য পমিত রীতি ব্যবহার করা শেয়, যা সহজবোধ্য এবং পাঠকের জন্য বোধগম্য হয়। এভাবে ভাষার সৌন্দয, স্পষ্টতা এবং পাঠযোগ্যতা রক্ষা করা সম্ভব।

বাংলা ভাষার রীতি ও বিভাজন তার সমৃদ্ধ ইতিহাস, বহুমাত্রিক ব্যবহার ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের পরিচয় বহন করে। কথ্য রীতি ভাষার প্রাণ, যা মানুষ মুখে মুখে ব্যবহার করে। আঞ্চলিক কথ্য রীতি আমাদের সমাজের শিকড়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং অঞ্চলভেদে ভাষার সৌন্দয ও বৈচিত্র্য প্রকাশ করে। আবার আদশ কথ্য রীতি গড়ে তোলে এক সাধারণ যোগাযোগভিত্তিক কাঠামো, যা সব শ্রেণি ও পেশার মানুষের জন্য সহজবোধ্য ও গ্রহণযোগ্য।

লেখ্য ভাষা রীতিতে ধরা পড়ে বাংলা ভাষার ইতিহাস ও বিবর্তনের ধারা। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক প্রমিত রীতি পর্যন্ত বাংলা ভাষা নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে। সাধু রীতি, কাব্য রীতি ও প্রমিত রীতি– প্রতিটি রীতিই একটি নির্দিষ্ট যুগের ভাষা প্রয়োগ, সাহিত্যচর্চা ও সমাজের বোধকে প্রতিফলিত করে। আজকের দিনে প্রমিত রীতি সর্বজনগ্রাহ্য ও কার্যকর লেখ্য রূপ হিসেবে গৃহীত হলেও, পূর্বের রীতিগুলোর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও সাহিত্যিক বৈচিত্র্য ভাষার মূল সম্পদ।

একবিংশ শতকে এসে রীতির জ্ঞান কেবল ভাষার শুদ্ধ ব্যবহার নয়; বরং ভাষার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক প্রেক্ষাপট বোঝার জন্যও অপরিহার্য। ভাষার রীতি ও বিভাজনের এই জ্ঞান আমাদের চিন্তা, প্রকাশ ও সাহিত্যিক অভিব্যক্তিকে আরও সুসংহত ও সৃজনশীল করে তোলে।

বাংলা ভাষার এই রীতি ও বিভাজন আমাদের ভাষাভিত্তিক পরিচিতি গড়ে তোলে, যার মাধ্যমে আমরা অতীতকে জানি, বর্তমানকে বুঝি এবং ভবিষ্যতের পথ রচনা করি।

মিশ্র ভাষা

একাধিক ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ একই এলাকায় বসবাস করলে তাদের ভাষাগুলোর মিশ্রণে যে নতুন ভাষা রীতির উদ্ভব হয় তাকে মিশ্র ভাষা বলে। যেমন– বিচ-লা-মার, পিজিন-ইংরেজি। আমাদের দেশের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মিশ্র ভাষার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। তারা আনুষ্ঠানিক পরিবেশে প্রমিত ভাষা ব্যবহার করলেও কথার মধ্যে বেশিরভাগই ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে থাকে। এটি আর্থসামাজিক কারণে ইংরেজি ভাষার প্রতি আমাদের দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ।

মিশ্র ভাষার বৈশিষ্ট্য:

১. মিশ্র ভাষা কেবল কথ্য ভাষা হিসেবে বিশেষ করে, অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়। এ ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির সম্ভাবনা ক্ষীণ।
২. এই ভাষার কোনো বিধিবদ্ধ বা সুনির্দিষ্ট নীতি বা ব্যাকরণ নেই।
৩. এর শব্দভান্ডার সীমিত।
৪. এই ভাষাবিস্তার সীমিত।

মিশ্র শব্দ

একাধিক ভাষার শব্দের সমন্বয়ে গঠিত শব্দকে মিশ্র শব্দ বলে। যেমন–

কয়েকটি মিশ্র শব্দের উদাহরণ

কদমবুসি (কদম + বুসি) = আরবি + ফারসি
রাজাবাদশা (রাজা + বাদশা) = তৎসম + ফারসি
হেডমৌলবি (হেড + মৌলবি) = ইংরেজি + ফারসি
হেডপণ্ডিত (হেড + পণ্ডিত) = ইংরেজি + তৎসম
খ্রিস্টাব্দ (খ্রিস্ট + অব্দ) = ইংরেজি + তৎসম
ডাক্তারখানা (ডাক্তার + খানা) = ইংরেজি + ফারসি
চৌহদ্দি (চৌ + হদ্দি) = ফারসি + আরবি
হাটবাজার (হাট + বাজার) = বাংলা + ফারসি ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য: মিশ্র ভাষায় সংশ্লিষ্ট সব ভাষার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। তবে, উন্নত ভাষাটির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়।

জোড়কলম শব্দ বা খিচুড়ি শব্দ

প্রচলিত ব্যাকরণবিধির তোয়াক্কা না করে একটি শব্দ বা তার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য একটি শব্দের অংশবিশেষ যোগ করে গঠিত নতুন শব্দকে জোড়কলম শব্দ বলে। ইংরেজিতে এমন শব্দকে বলা হয় portmanteau word. সন্ধি, সমাস, প্রত্যয় বা অন্য কোনো

ব্যাকরণিক নিয়মে গঠিত শব্দ জোড়কলম শব্দ হবে না। জোড়কলম শব্দ গঠনের একটি সাধারণ রেওয়াজ আছে। যে দুটি শব্দ নিয়ে জোড়কলম শব্দ গঠিত হয়, তার প্রথমটির শেষাংশ এবং দ্বিতীয়টির প্রথমাংশ ছেঁটে ফেলে যা থাকে তা ক্রমানুসারে পাশাপাশি একীভূতকরণের মাধ্যমে জোড়কলম শব্দ তৈরি করা হয়। যেমন– Camera + Recorder = Camcorder, ধোঁয়া + কুয়াশা = ধোঁয়াশা প্রভৃতি। পদ্ধতিটি অনেকটা গাছের অজ্ঞাজপ্রজননের জোড়কলম পদ্ধতির মতো। তাই নাম হয়েছে জোড়কলম শব্দ। এর অন্য নাম খিচুড়ি শব্দ।

প্রমিত ভাষা ও আঞ্চলিক উপভাষার মধ্যে পার্থক্য

১. প্রমিত ভাষা ভাষাভাষী অঞ্চলে সর্বজন-ব্যবহার্য। অঞ্চলভেদে এর কোনো পরিবর্তন হয় না। উপভাষা ক্ষুদ্রতর অঞ্চলে ব্যবহার্য। সব ভাষাভাষীর কাছে এটি গ্রহণযোগ্য হয় না। উপভাষা কোনো একটি একক ভাষার অঞ্চলভিত্তিক রূপ। অঞ্চলভেদে এটি ভিন্নরূপ ধারণ করে।

২. প্রমিত ভাষাশিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি শিখতে হয়। উপভাষা সাধারণত শিক্ষার মাধ্যম হয় না। জন্মগতভাবে এটি শিশুর আয়ত্তে চলে আসে।

৩. প্রমিত ভাষায় অধিকাংশ সাহিত্য রচিত হয়। আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্যের সংখ্যা ও প্রচার নগণ্য ও সীমিত।

৪. সরকারি কাজকর্ম প্রমিত ভাষায় পরিচালিত হয়। আঞ্চলিক ভাষায় সরকারি কাজ হয় না।

৫. প্রমিত ভাষার কথ্য ও লেখ্য– উভয়রূপই গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক। উপভাষার ক্ষেত্রে কেবল কথ্য রূপটিই গুরুত্বপূর্ণ।

৬. প্রমিত ভাষার সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণ বিধি থাকে এবং তা না মানলে অশুদ্ধ গণ্য হয়। আঞ্চলিক ভাষায় কোনো ব্যাকরণ বিধি থাকে না।

৭. ভাষাবিদ, সাহিত্যিক ও শিক্ষিত সমাজের মাধ্যমে পরিমার্জিত হয়ে ভাষা যে রূপটি সর্বজনীনভাবে গৃহীত হয় সেটি প্রমিত ভাষা। উপভাষা মৌখিক ভাষার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। এর রূপায়নে কারও পরিকল্পিত প্রচেষ্টা দেখা যায় না।

৮. প্রমিত ভাষায় সংশ্লিষ্ট কেবল শিষ্ট রূপটি গৃহীত হয়। উপভাষায় শিষ্ট ও অশিষ্ট দুটি রূপই ব্যবহৃত হয়।

৯. শিক্ষিত, অভিজাত ও উচ্চবিত্তের লোকজনের মধ্যে প্রমিত ভাষা ব্যবহারের আধিক্য দেখা যায়। অঞ্চলভিত্তিক লোকের আলোচনায় এই ভাষার বহুল প্রয়োগ লক্ষণীয়।

১০. চলিত ভাষা ভাব বিনিময়ের সর্বজন গ্রাহ্য ভাষা। উপভাষায় ভাব বিনিময় কেবল নির্দিষ্ট অঞ্চলে গ্রাহ্য হয়।

১১. প্রমিত ভাষা কোনো নির্দিষ্ট ভাষার আধুনিক ও মার্জিত রূপ। উপভাষা বংশপরম্পরায় চলে আসা রূপ।

১২. প্রমিত ভাষায় বাক্য গঠন ও শব্দ চয়নে সুনির্দিষ্ট নীতি ও মাধুর্য আছে। উপভাষায় এরূপ কোনো নিয়ম নেই। যার যেমন ইচ্ছে তেমন করে বলতে পারে।

১৩. প্রমিত ভাষা ওই ভাষাভাষীর সবার কাছে পরিচিত এবং সহজবোধ্য। উপভাষায়, অঞ্চলভেদে শব্দ, বাক্য ও গঠন পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই সবার কাছে সহজবোধ্য নয়।

১৪. চলিত ভাষা, ওই ভাষার বর্ণ দিয়ে সহজবোধ্য ও সুনির্দিষ্ট উচ্চারণে লেখা যায়, উপভাষার রীতি ওই ভাষার বর্ণ দিয়ে সহজবোধ্য ও সুনির্দিষ্ট উচ্চারণে নাও লেখা যেতে পারে। কারণ, উপভাষার উচ্চারণ মূল ভাষার উচ্চারণ হতে অনেক ক্ষেত্রে ভিন্ন।

১৫. প্রমিতভাষী অঞ্চলে বা যে অঞ্চলের ভাষাকে প্রমিত ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে সে অঞ্চলের লোকদের কাছে প্রমিত ভাষা ও উপভাষা অভিন্ন।

বাংলা কাব্যভাষা: রীতি, ছন্দ ও বিবর্তন

পদ্য থেকে গদ্য কবিতা পর্যন্ত একটি পর্যালোচনা

কাব্যভাষা সাধারণ ভাষার অলংকৃত রূপ। এর নিজস্ব ব্যাকরণ আছে। ছন্দ, মিল ও শব্দচয়নের নিয়ম আছে। চর্যাপদ থেকে আজকের আধুনিক কবিতা পর্যন্ত বাংলা কাব্যভাষা বহু স্তর পার করেছে। এই প্রবন্ধে কাব্যভাষার গঠন, ছন্দের তিনটি প্রধান রীতি, মিল ও মিলহীনতার সম্পর্ক এবং ১৯৪৫ সালের আগে-পরের কাব্যভাষার রূপান্তর তুলে ধরা হয়েছে।

কাব্যভাষা কী?

কাব্যভাষা সাধারণ ভাষা থেকে আলাদা। এর গঠন নিয়মবদ্ধ। এর শব্দচয়ন সচেতন। এর বাক্য ভাব ও সৌন্দর্যের জন্য সাজানো হয়। দৈনন্দিন কথাবার্তায় আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, তার সাথে কবিতার ভাষার পার্থক্য আছে। কবিতার ভাষায় শব্দের ধ্বনি, ভাব ও ছন্দ একসঙ্গে কাজ করে।

বাংলা লেখ্য ভাষায় চারটি প্রধান রীতি দেখা যায় – কাব্য রীতি, সাধু রীতি, চলিত রীতি এবং প্রমিত রীতি। এগুলোর মধ্যে কাব্য রীতি সবচেয়ে পুরোনো। বাংলা ভাষার আদিতম নিদর্শন ‘চর্যাপদ’ এই কাব্য রীতিতেই রচিত। প্রায় হাজার বছর আগের সেই রচনা থেকে আধুনিক কবিতা পর্যন্ত কাব্যভাষা নানা রূপ ধারণ করেছে।

কাব্যভাষার ব্যাকরণ

কাব্যভাষার ব্যাকরণ গদ্যের ব্যাকরণ থেকে কিছুটা আলাদা। এখানে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়:

১. কাব্যভাষায় শব্দের ক্রম পরিবর্তন করা যায়। গদ্যে কর্তা-কর্ম-ক্রিয়ার যে নির্দিষ্ট ক্রম, কবিতায় তা মানা হয় না। ছন্দের প্রয়োজনে শব্দ এগিয়ে-পিছিয়ে বসানো হয়।

২. কাব্যভাষায় তৎসম, তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি – সব ধরনের শব্দ অবাধে ব্যবহৃত হয়। কবি প্রয়োজনমতো প্রাচীন শব্দ বা আঞ্চলিক শব্দও আনতে পারেন।

৩. কাব্যভাষায় সাধু ও চলিত – দুই রীতির ক্রিয়ারূপই দেখা যায়। ‘করিল’ এবং ‘করল’ – দুটোই কবিতায় ব্যবহৃত হতে পারে। ছন্দ ও মাত্রার প্রয়োজনই এখানে মুখ্য।

৪. অনেক সময় শব্দের রূপ সংকোচন করা হয়। ‘হইয়াছে’-কে ‘হয়েছে’ বা ‘হ’য়ে’ লেখা হয়। ছন্দের মাত্রা মেলানোর জন্য এই সংকোচন।

NABARUN PUBLICATION